হুমায়ুন আজাদ-এর দুর্লভ সাক্ষাৎকার

[১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার হুমায়ুন আজাদের *নারী* বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তার কিছুদিন পরে এ সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়। এটি দু পর্বে *দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার* তখনকার সময়ের বিশেষ পাতা 'সাক্ষাৎকার'-এ ছাপা হয়েছিল। হুমায়ুন আজাদ আরো পরে তাঁর দেয়া সাক্ষাৎকারের একটি সঙ্কলন *আততায়ীদের সঙ্গে কথপোকথন* প্রকাশ করেন, সেখানে প্রায় সব সাক্ষাৎকার সংযোজিত হলেও এটি তিনি সঙ্কলিত করেন নি। সাক্ষাৎকারে নিষিদ্ধ ঘোষিত বই *নারী*, তসলিমা নাসরিন, এরশাদ, আল মাহমুদ, সচিব, মন্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, প্রবচন ইত্যাদি বিবিধ প্রসঙ্গে খোলামেলা কথা বলেছেন হুমায়ুন আজাদ। উল্লেখ্য ২০০০ সালে হাইকোর্টের রায়ে *নারী* বইয়ের নিষেধাজ্ঞা বাতিল ঘোষিত হয়। আজাদ সাক্ষাৎকারে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, "এই বই আছে এবং থাকবে, বরং যারা নিষিদ্ধ করেছে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে, নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।"

২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি গুপ্তঘাতকদের আক্রমণে মারাত্মক ভাবে আহত হন হুমায়ুন আজাদ। আরোগ্য লাভের পর একই বছরের আগস্ট মাসে জার্মান রোমান্টিক কবি হাইনরিখ হাইনের ওপর গবেষণা কাজে জার্মান যাত্রা করেন। সেখানে ১১ আগস্ট মিউনিখ শহরে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে আকস্মিক ভাবে মারা যান তিনি। অকালপ্রয়াত হুমায়ুন আজাদের একষট্টিতম জন্মদিন মনে রেখে দুর্লভ এ সাক্ষাৎকারটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো।
– বি. স.]

হুমায়ুন আজাদ (২৮/৪/১৯৪৭-১১/৮/২০০৪)

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন: রাজু আলাউদ্দিন ও ব্রাত্য রাইসু

ব্রাত্য রাইসু: আপনার *নারী* নিষিদ্ধ হয়েছে। এই মুহূর্তে আপনি কী ভাবছেন?

হুমায়ুন আজাদ: হ্যাঁ, বেশ অদ্ভুত হচ্ছে। তবে আমি বইটি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এটি মনে করছি না, বা মনেও হচ্ছে না।

রাইসু: প্রসিদ্ধ হলো বরং?

হুমায়ুন: প্রসিদ্ধ এটি আগেই ছিলো। আমার মনে হচ্ছে যে এই বই আছে এবং থাকবে, বরং যারা নিষিদ্ধ করেছে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে, নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। এ-বইকে কারো পক্ষে নিষিদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো বইকে নিষিদ্ধ করে রাখা যায় নি। আর আমি তো বারবার বলেছি যে প্রতিটি নিষিদ্ধ

গ্রন্থ, প্রতিটি দগ্ধ গ্রন্থ সভ্যতাকে নতুন আলো দেয়। কাজেই বলা যাক, বইটি এখন নতুন আলো দিচ্ছে। আমার ভালোই লাগছে বলা যায়। যদিও আমি এই সরকারি সিদ্ধান্তকে বিনা প্রতিবাদে বাস্তবায়িত হতে দেবো না।

রাইসু: প্রতিবাদের জন্যে কী করছেন?

তসলিমা কিন্তু তার ঐ নারীবাদী কলাম লেখা শুরু করেছিলো আমার লেখাকেই নকল করে। আমি যখন নারীবাদী লেখা শুরু করি আমার লেখাকে নকল করে বা অনুকরণ করে সে লেখা শুরু করেছে। এবং তার যে বিষয় সেগুলো অত্যন্ত লঘু। বলা যায়, সাড়া জাগানোর জন্য হিসেব করে লেখা।

হুমায়ুন: এখন তো আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সাক্ষা কারে আমার বক্তব্য বলছি। যারা বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের মানসিকতা সম্পর্কে বলছি এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমি মোটামুটি যেখানে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তারা আমার বক্তব্যের সাথে একমত। চারপাশে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংঘ নানাভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তবে সরকারি এই আদেশ প্রত্যাহার করাতেই হবে এবং করাবার পদ্ধতি সম্ভবত আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা। কারণ আদালতেই শুধুমাত্র একটি অন্যায় আদেশকে বাতিল করার শক্তি রাখে। আমরা উচ্চ আদালতে অবশ্য আবেদন করবো, আমি নিশ্চিত যে এই নিষেধাজ্ঞা অবৈধ বলে গণ্য হবে।

রাইসু: আপনার *নারী* পাঠ করতে স্যার সরকারের মোট কতদিন লাগলো?

হুমায়ুন: ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৯৫-এর ১৯ নভেম্বরে যতদিন হয়। তবে বই আমার ধারণা এই সরকার সম্পূর্ণ পড়ে ওঠে নি। কারণ আমাদের মন্ত্রী এবং আমলাদের সম্পর্কে আমি জানি। তারা যে বই মন দিয়ে পড়তে পেরেছে এমন নয়। হয়তো এখানে-সেখানে তাকিয়ে দু'চারটি বাক্য পড়েছে এবং ভেবেছে বেশ পাওয়া গেছে।

রাজু আলাউদ্দিন: হবে স্যার, সিরিয়াসলি পড়েছে, নইলে এত সময় কেন লাগে?

হুমায়ুন: ওদের তো চল্লিশ ব সর লাগার কথা ছিলো। তবু তো চার বছরে পড়ে উঠেছে।

রাজু: *নারী* নিয়ে আপনার ভবিষ পরিকল্পনা কী?

হুমায়ুন: বই নিয়ে, না বাস্তব নিয়ে?

রাজু: দুইটাই স্যার।

হুমায়ুন: না, বই তো নিষিদ্ধ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। বইটির নতুন অর্থা তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে সেপ্টেম্বর মাসে, এবং আমি নিশ্চিত ওই বইটির খবর এই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাখে না। ওরা হয়তো সেই প্রথম সংস্করণ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে, বা দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। কারণ ওরা তো আর বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে উঠতে পারে নি। প্রথম বা দ্বিতীয় সংস্করণ নিয়ে বানান ক'রে ক'রে পড়েছে।

রাজু: আদি নারীতেই ওনাদের মনোযোগটা ছিলো?

হুমায়ুন: আমার ধারণা ওরা এই নতুনটার খবর জানে না। আর নারী তো নিষিদ্ধ করা যায় না — এটা হচ্ছে পরিহাস। কিন্তু যুগ যুগ ধরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী নারী বিভিন্নভাবে নিষিদ্ধ। আমাদের সমাজে তো বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। নইলে এত বড় একটি বই লেখার প্রয়োজন হতো না।

রাজু: বেইজিং-এ তো স্যার বিশাল এক নারীসম্মেলন হলো?

হুমায়ুন: বেইজিং-এ যে বিশাল সম্মেলন হয়েছে, এটি জাতিসংঘের আয়োজিত। গত কয়েক দশক ধরেই জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশে এই ধরনের সম্মেলন করে আসছে। এবং এই সম্মেলনে নারীদের নানাভাবে নানারকম অধিকার দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু কায়রোতে যখন সম্মেলন হয়েছিলো, তারপর বেইজিং-এ যে সম্মেলন হলো তাতে দেখা গেছে যে একটি গোত্র — একটি গোত্রই বলা ভালো — নারীর এই সম্মেলন এবং সম্মেলনে যে সমস্ত প্রগতিশীল প্রস্তাব পেশ করা হয় সেগুলোর বিরুদ্ধে। এরা হচ্ছে সব ধরনের মৌলবাদীরা। মুসলমান মৌলবাদীরা এর বিরুদ্ধে, খ্রীষ্টান মৌলবাদীরা এর বিরুদ্ধে, এবং হিন্দু মৌলবাদীরাও এর বিরুদ্ধে। অর্থা মৌলবাদীরা এই বেইজিং সম্মেলনের বিভিন্ন প্রগতিশীল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারগুলো হচ্ছে কপট এবং দুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। ওরা ঐ সম্মেলনে গেছে।

রাজু: ‘দুষ্ট’ বললে ওদেরকে একটু আদর করে দুষ্ট বলা হলো না?

হুমায়ুন: উইকেড পিপল বলা যায়। ওরা ওখানে গেছে, এবং যাওয়াটা গৌরবজনক মনে করেছে। অনেক প্রস্তাব বাধ্য হয়ে মেনে এসেছে। কিন্তু দেশে এসে আর ওসব কথা মনে রাখে নি। তারপরে পৃথিবীর কয়েকটি মুসলমান দেশ তাদের বোরখা-পরা নারীদের পাঠিয়েছে। এই বোরখা-পরা নারীরা গিয়ে পুরুষের ওই সমস্ত পঁচা সমস্ত কথা গড়গড় গড়গড় ক’রে বলেছে। আর মৌলবাদীর কথা বলছিলাম। যে, মৌলবাদীরা এর বিরুদ্ধে। তো মৌলবাদ কিন্তু ধর্ম নয়। মনে করা হয় যে মৌলবাদ হচ্ছে ধর্ম। মৌলবাদ ধর্ম নয়। এটা হচ্ছে রাজনীতি। মৌলবাদীরা যদি ক্ষমতা দখল করতে পারে তাহলে আর অন্যদের কখনো ক্ষমতা দেবে না। ইরানে যেমন দখল করেছে এবং অন্যদের ক্ষমতা পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

রাজু: এই সরকার তো এর আগেও বেশ কিছু বই নিষিদ্ধ করেছে, আপনারটিই সর্বশেষ। সরকার কেন বই নিষিদ্ধ করে, আপনার কী মনে হয়?

হুমায়ুন: সরকার ঠিক কেন নিষিদ্ধ করে ভেতরের সংবাদ তো আমার জানা নেই। তবে আমি লক্ষ করছি এরা যখন একটি বইকে নিষিদ্ধ করছে তখনই এই ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার কথা বারবার বলছে। ধর্ম এদের একটি পুঁজিতে পরিণত হয়ে গেছে। ফলে তারা যখনই রাজনৈতিকভাবে অস্বস্তির মধ্যে থাকে তখনই দেশে ধর্মীয় ভাব জাগিয়ে তোলার একটি গোপন বা স্পষ্ট উদ্দেশ্য তাদের থাকে। এখন দেশ রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সময় একটু ধর্মীয় ভাবাবেগ যদি জাগিয়ে তোলা যায় এবং যদি তারা প্রমাণ করতে পারে বা দেখাতে পারে যে ইসলামের তারা এক বড় রকমের রক্ষক, তাহলে হয়তো নির্বাচনে এটা তাদের জন্য উপকারী হবে। ইসলামকে এখন তারা তাদের বাহ্যিক পোশাকে পরিণত করেছে। এটাকে তারা একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। এই সরকারের সময় বেশ কয়েকটি বই নিষিদ্ধ হয়েছে। ঐ বইগুলো সম্ভবত এই *নারী*র মত গুরুত্বপূর্ণ বই নয়। ঐ লেখকেরাও অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নন। এবং ঐ বইগুলো সম্পর্কে, একটি ছাড়া, সাধারণ পাঠক অবহিতও ছিল না।

রাইসু: কোন একটা স্যার?

হুমায়ুন: নিষিদ্ধ করার ফলেই ওটি সম্পর্কে আগ্রহ বেশি জেগে গিয়েছিল। নইলে ওটা প্রকাশের পর ৬ মাস ধরে অনেকটা অপরিচিতই ছিল। সেটি *লজ্জা* বলে যে বইটি। প্রকাশের ৬ মাস ৭ মাস ৮ মাস অপরিচিত ছিলো।

রাইসু: তসলিমা নাসরিন নামটি কি আপনি স্যার মুখে আনতে চাচ্ছেন না?

রাজু: উচ্চারণযোগ্য নয় স্যার?

হুমায়ুন: কোনো প্রয়োজন নেই।

রাইসু: তসলিমা এবং আপনি, আপনারা দুজনই মোটামুটি নিষিদ্ধ হলেন? আপনারা দুজনই নারীবাদী। এক ধরনের মিল আছে তসলিমার সঙ্গে আপনার?

হুমায়ুন: হ্যাঁ, এক ধরনের মিল রয়েছে। দেখা যাক। তসলিমা কিন্তু তার ঐ নারীবাদী কলাম লেখা শুরু করেছিলো আমার লেখাকেই নকল করে। আমি যখন নারীবাদী লেখা শুরু করি আমার লেখাকে নকল করে বা অনুকরণ করে সে লেখা শুরু করেছে। এবং তার যে বিষয় সেগুলো অত্যন্ত লঘু। বলা যায়, সাড়া জাগানোর জন্য হিসেব করে লেখা। আর তার যে বইটি নিষিদ্ধ হয়েছে সেটি কিন্তু নারীবাদী বই নয়। তার নারীবিষয়ক কলামের বই, সেগুলো কিন্তু নিষিদ্ধ হয় নি। মনে রাখতে হবে তার যে-বইটি নিষিদ্ধ হয়েছে সেটাও সুপরিকল্পিতভাবে সাড়া জাগানোর জন্য লেখা এবং দেশকে একটা সাম্প্রদায়িক সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে ওই —

রাইসু: ফলে ওই বই নিষিদ্ধ করা ঠিক-ই ছিলো?

হুমায়ুন: আমি অবশ্য কোনো বই-ই নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতি নই। আমি মনে করি বই চিন্তার প্রকাশ। মানুষ বিভিন্ন রকম চিন্তার প্রকাশ ঘটাবে। যদি ঐ চিন্তা মূল্যবান হয় তাহলে গৃহীত হবে আর যদি মূল্যবান চিন্তা না হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে অনুপস্থিত হয়ে যায়।

রাজু: কিন্তু যদি খুব ক্ষতিকর-চিন্তাসম্পন্ন কোনো বই হয় সে ব্যাপারে কি কোনো নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন পড়বে?

রাইসু: যেমন ধরা যাক, খুন করার পদ্ধতি বিষয়ে একটা বই বের হলো — ?

রাজু: বা আত্মহত্যার পদ্ধতি সম্পর্কে একটা বই? আপনি নিজেকে কীভাবে ধ্বংস করবেন এ-ব্যাপারে একটা বই?

হুমায়ুন: আমি মনে করি, কোনোরকম চিন্তাই নিষিদ্ধ করা উচিত নয়। যদি এমনকি এ-ধরনের বইও বের হয় আত্মহত্যার সহজ কৌশল, বা —

রাইসু: ধর্ষণ করবার সহজ কৌশল, স্যার?

হুমায়ুন: ধর্ষণ করা নিয়েও যদি হয় আমি ঐ বই দেখে হাসবো। যে, একটি মানুষ এই ধরনের বইও লিখতে পারে। আমি ঐ বইয়ের জন্য কোনো আগ্রহ বোধ করবো না। তবে অনেকে আগ্রহ বোধ করবে। কিন্তু এটি কিন্তু সত্য নয়। আত্মহত্যার সহজ পদ্ধতি সম্পর্কে যদি কোনো বই লেখা হয় এবং অনেকেই পড়ে তাহলেই যে সে ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করবে এমন নয়। পৃথিবীতে বহু বই লেখা হয়েছে, বহু বই আমরা পড়েছি। বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো আমরা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে যাই না।

রাইসু: আর, আত্মহত্যার কোনো পদ্ধতিই সহজ না, ফলে 'আত্মহত্যার সহজ কৌশল' এরকম হতে পারে না?

হুমায়ুন: আমি কিন্তু আত্মহত্যার সহজ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়েছি। ইংরেজি ভাষায় লেখা। তারা এগুলো লিখেছে। বলেছে, আত্মহত্যার সবচে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে গ্যাসের চুলোর ওপর মাথা চেপে রাখা। যেমন সিলভিয়া প্লাথ এ-পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজিতে কিন্তু এ-বিষয়ে বিচিত্র লেখা হয়েছে। এটি মনে রাখতে হবে যে, কোনো একটি বিষয়ে বই লেখা হলো এবং পাঠক পড়লো এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তা বাস্তবায়িত করা শুরু করে না।

রাইসু: আপনার *নারী* বইটি যে পাঠক পড়লো,তারা এটির চর্চা তেমন শুরু করে নি স্যার?

হুমায়ুন: এটি পদ্ধতিমূলক বই নয়। এটি তাদেরকে –

রাইসু: আধ্যাত্মিকভাবে — ?

হুমায়ুন: এই বই তাদেরকে অনেক নতুন তথ্যও দিয়েছে। এবং যে-সমস্ত বিষয়গুলো তারা সচেতনভাবে বোধ করেনি সেগুলো সম্পর্কে তারা সচেতন হয়েছে। এবং এর ফলে তারা অনেকেই ধীরে ধীরে বদলে গেছে।

রাইসু: সামাজিক কোনো চেন্জ এসেছে স্যার?

হুমায়ুন: সামাজিক পরিবর্তন তো — এই বইয়ের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটলে এত দ্রুত চোখে পড়বে না। কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তন বলা যাক, এ-বই যেসব তরুণেরা পড়েছে, বিশেষ করে সে তরুণদের মানসিকতার নানারকম পরিবর্তন ঘটেছে।

রাইসু: সেটা কি আপনি দেখেছেন, ছোটখাটো দৃষ্টান্ত কি আপনার চোখে পড়েছে স্যার?

হুমায়ুন: বোঝা যায়, অনেক তরুণী যে এখন আর নিজেকে, বলা যাক, পুরুষের থেকে অসহায় বলে মনে করে না। অনেকের মধ্যেই 'আমার পেশা আমাকেই বেছে নিতে হবে, আমাকেই উপার্জন করতে হবে' এই রকম মানসিকতা হয়েছে। এটি এমন কি আজ ভোরে এক মহিলা আমাকে টেলিফোন করেছেন। তিনি বললেন যে, ঐ বইয়ে যে নারীর শরীর বিষয়ক অংশ রয়েছে তা পড়ে তিনি তার নিজের শরীর সম্পর্কে জেনেছেন। এ রকম অনেকেই শিখেছে। আমি জানি, ঐ যে নারীর শরীর বিষয়ক যে-পরিচ্ছেদটি রয়েছে, এটি লেখার একটি কারণ হচ্ছে, আমি অনেক শিক্ষিত পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত ৩/৪ সন্তানের মাতাকে প্রশ্ন করে দেখেছি যে তারা নিজেদের শরীর সম্পর্কে বিশেষ সচেতন না। জানে না যে কোন প্রত্যঙ্গের কী ভূমিকা। এমনকি নারীদের যে একটি মাসিক চক্র রয়েছে সেটি সম্পর্কেও তারা সচেতন নয়। তারা সেটি হিসেব করতে জানেন না, অথচ ৩ সন্তানের মাতা। এবং পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত!

রাইসু: আপনি নিজেই জিগ্যেশ করেছেন স্যার?

হুমায়ুন: আমি তো এ বই লেখার সময় অনেকের সাক্ষা কার নিয়েছি যে —

রাইসু: তারা হয়তো সত্যি কথা বলে নাই। লজ্জায় স্যার?

হুমায়ুন: ৩ সন্তানের মাতা এবং পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত যদি লজ্জায় নববধূর মতো হয় তাহলে তো চলবে না। তারা আমাকে সত্যিই বলেছে।

রাইসু: না স্যার, তারা হয়তো আপনাকে পরপুরুষ ভেবে বলে নাই সবকিছু?

হুমায়ুন: না, তারা পরপুরুষের কাছেই বেশি বলতে আগ্রহী।

রাইসু: সেক্ষেত্রে, এটি কি স্যার নারীবাদী গ্রন্থ, আপনার *নারী*।

হুমায়ুন: তুমি দেখছি বিশেষ লেখাপড়া করো নি! এটা পড়লেই বুঝতে পারবে–

রাইসু: এটা পড়তে আমি পারি নাই স্যার। পড়ার সৌভাগ্য হয় নাই আমার।

হুমায়ুন: এটি কোন বাদী গ্রন্থ তোমারই জানা উচিত। সাক্ষা কার গ্রহণকারীর সমস্ত সংবাদ আগেই রাখা দরকার।

রাইসু: সব জিনিস যদি আগেই জেনে আসে তাহলে সে জানতে চাইবে কী, স্যার?

হুমায়ুন: প্রশ্ন করবে, অনেক বিষয়ে তার হয়তো দ্বিমত থাকতে পারে।

রাইসু: না স্যার, দ্বিমত প্রতিপন্ন করা বোধহয় সাক্ষা কার গ্রহণকারীর কাজ না। সাক্ষা কারকারী সবই জানবে স্যার নতুনভাবে। আমি বলতে চাচ্ছি, আপনার বই নারীবাদী যে প্রচলিত আন্দোলনগুলো চলছে, এসবের কোনো সমালোচনা করে কিনা, তার নিজস্ব অবস্থান থেকে?

মৌলবাদ ধর্ম নয়। এটা হচ্ছে রাজনীতি। মৌলবাদীরা যদি ক্ষমতা দখল করতে পারে তাহলে আর অন্যদের কখনো ক্ষমতা দেবে না। ইরানে যেমন দখল করেছে এবং অন্যদের ক্ষমতা পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

হুমায়ুন: এখন এই বই সম্পর্কে ধারণা অনেকেই মোটামুটি রাখেন। যে, এটি যে বাংলা ভাষায়, প্রথম, পূর্ণাঙ্গ, নারী বিষয়ক, নারীবাদী গ্রন্থ। নারী সম্পর্কে বই আগেই লেখা হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়তো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। 'ইসলামে নারীর অবস্থান' — ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। বা আমাদের প্রথাগত সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে যে, প্রথাগতভাবে আমরা নারীকে যেভাবে দেখে আসছি, সেভাবেই থাকবে। নারী কতোটা পর্দা করবে, নারী কী করে তার সন্তানদের লালনপালন করবে, স্বামীর সেবা করবে — এ ধরনের বই আগেও লেখা হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখা হলো, যে, 'নারী কী'?

রাজু: এবং কেন — ?

হুমায়ুন: হাঃ হাঃ। এবং নারী কি তথাকথিত জন্মসূত্রে নারী, না এই সমাজব্যবস্থাই তাকে ক্রমশ নারী করে তোলে। এবং এ-বইটি তো আয়তনে খুবই বড়। নারীবাদী তত্ত্বের সঙ্গে কিন্তু আমাদের এখানে যারা নারীর উন্নতি সম্পর্কে কিছু কাজ করছিলেন বা বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করেছিলেন তারা পরিচিত ছিলেন না। যে-কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করতে হলে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দরকার হয়, সে তাত্ত্বিক কাঠামো এখানে কখনোই ছিলো না। যেমন এর আগে, এমনকি পাকিস্তান-কালেও, পাকিস্তান সরকারও নারীদের কল্যাণের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, যেমন আপওয়া ছিলো — আপওয়া হচ্ছে অল পাকিস্তান উইমেন্স এসোসিয়েশন — তাদের কাজ ছিলো আমলা এবং মন্ত্রী এবং কিছু ব্যবসায়ীর স্ত্রীরা একটি সংঘে মিলিত হতো। তারা মাসে একবার বা দু'বার পার্টি করতো। বা কোনো মন্ত্রী এলে তাকে সংবর্ধনা জানাতো। বা এসডিও'র স্ত্রী গিয়ে প্রতিদিন ফিতা কাটতো। এই সমস্ত কাণ্ড –

রাইসু: নারীবাদী কাণ্ড!

হুমায়ুন: বলা যাক, প্রাক-নারীবাদী কাণ্ড হয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা একটা তাত্ত্বিক কাঠামো যে, নারী কী, নারীর অবস্থান কোথায়, এবং কি এ অবস্থানের মধ্যেই থাকবে...? এবং এ-ব্যাপারটি –

রাইসু: একজন পুরুষই তাহলে প্রথম দিলেন এ-ব্যাপারটি?

হুমায়ুন: না, আসলে তত্ত্ব যেটি এর মধ্যে রয়েছে, বলা যাক, বাংলা ভাষায় একজন পুরুষই প্রথম প্রস্তাব করেছে। কিন্তু এই তত্ত্বটি কিন্তু নতুন নয়। নারীবাদের যে তত্ত্বটি আমার এই বইয়ের মধ্যে আমি ব্যবহার করেছি, সেটা মোটামুটি ওলস্টোনক্রাফট, সিমন দ্য বভোয়া এবং কেইট মিলেটের যে তত্ত্ব তার মধ্যে একটা, বলা যাক, সমন্বয়

সাধন করে এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা উপস্থাপন করেছি। কেইট মিলেটের তত্ত্বটি আমার বইয়ের মধ্যে কিন্তু একটু প্রবলভাবে রয়েছে। আমি ওর যে তত্ত্বের তীব্রতা এটি খুবই পছন্দ করি। কেইট মিলেটের একটি গ্রন্থ রয়েছে এবং সেটি তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভও বটে। এত অ-প্রথাগত অভিসন্দর্ভও আর হয় না। অভিসন্দর্ভে অনেক সম্মান শ্রদ্ধা রেখে লিখতে হয়। তিনি এখানে বড় বড় লেখকদের সহজেই বাতিল করেছেন এবং একটি তত্ত্ব তিনি প্রস্তাব করেছেন যে — যেটাকে বলা হচ্ছে 'সেকশুয়্যাল পলিটিক্স': লৈঙ্গিক রাজনীতি। তার কাছে নারী এবং পুরুষের যে-সম্পর্ক, যাকে আমরা কত আধ্যাত্মিক পরিভাষায় চিহ্নিত করে থাকি, তার কাছে এটা আসলেই হচ্ছে একটি লৈঙ্গিক-রাজনীতিক সম্পর্ক। যেমন রাজনীতির কাজ হচ্ছে ক্ষমতা অধিকার করা, বা ক্ষমতা অধিকারে ব্যর্থ হওয়া। যারা ক্ষমতা অধিকার করে তারা যারা ব্যর্থ হয় তাদের উপর শাসন করে থাকে। তাদের কেন, অন্যদের ওপরও শাসন করে থাকে। ক্ষমতা কখনো কখনো সকলের সম্মতির সাহায্যেও অধিকার করা যায়। বা কখনো শক্তিপ্রয়োগে অধিকার করা যায়। আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন হয়। ঠিক এখানেও পুরুষ কী করেছে, বলা যাক শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে এই ক্ষমতা অধিকার করেছে এবং সেটি আজ থেকে প্রায় ৬, ৭, ৮, ১০ হাজার বছর আগে থেকে এই অধিকার অর্জন করেছে। তারপর শক্তিমান পুরুষ দুর্বল পরাভূত নারীর ওপর, বলা যাক, শাসন করেছে। শাসক কিন্তু নিজের মনের আনন্দে অত্যাচার করে না। শাসক তখনই অত্যাচার করে যখন দেখে যে তার আধিপত্য বিঘ্নিত হচ্ছে। যখন দেখে যে তাকে আর মান্য করা হচ্ছে না তখনই সে অত্যাচার করে। নইলে অত্যাচার কিন্তু শখে করে না। মানে, শাসকমাত্রই স্যাডিস্ট না। কিন্তু যখন দেখা যায় যে আমার রাজত্বকে, আমার সিংহাসনকে, আমার রাজদণ্ডকে স্বীকার করা হচ্ছে না —

রাইসু: রাজদণ্ড! আপনি কি স্যার প্রতীকী অর্থে বললেন?

হুমায়ুন: হ্যাঁ, পুরুষ মাত্রই তো রাজা। তার রাজদণ্ড। এবং সভ্যতা তো পুরুষেরই সভ্যতা। এ-সংস্কৃতি পুরুষের সংস্কৃতি। এবং কেইট মিলেট খুবই চম কার। কেইট মিলেট দেখাচ্ছে যে নারী-পুরুষের যে স্বাভাবিক মিলন এটিও একটি রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। এবং সিমন দ্য বভোয়া কিন্তু এ-ব্যাপারটি খুব চম কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যে, নারী এবং পুরুষের যে মিলন, বলা যাক সঙ্গম, সেখানে পুরুষ প্রভুর ভূমিকা পালন করে। সে উপরে থাকে। বিদ্ধ করে। এবং নারী বিদ্ধ হয়, এমনকি একদিকে পরাজিত হওয়ার গ্লানিও বোধ করে থাকে। পরাজয়ই তার নিয়তি যেহেতু সে সেটি মেনে নেয়। কেইট মিলেট আরো তীব্র, আরো তীক্ষ্ণ, আরো আক্রমণাত্মক। সিমন দ্য বভোয়া হচ্ছে খুবই কাব্যিক, আরো বিশ্লেষণাত্মক এবং বোধে পরিপূর্ণ।

রাইসু: আপোষকামী?

হুমায়ুন: আপোষকামী বলবো না। ওই সময়ে তিনি তো — আধুনিক নারীবাদের জননীই তাকে বলবো।

রাইসু: জননী তো স্যার বলা যাবে না, তাহলে আবার নারীবাদ-বিরোধী হয়ে যাবে। জনক বলতে হবে?

হুমায়ুন: না, জনক হলেই নারীবাদ-বিরোধী হবে, সেক্সিস্ট হবে। যে, কেন জনক হতে হবে। আমি যা বলছিলাম, কেইট মিলেট একেবারে যে আমাদের একান্ত অন্তরঙ্গ গোপন মানবিক সম্পর্ক একেও তিনি রাজনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করছেন। ফলে যে পরিবার হয়েছে, সমাজ হয়েছে, সংস্থা হয়েছে, রাষ্ট্র হয়েছে, সভ্যতা হয়েছে — সবকিছুই হচ্ছে রাজনৈতিক সম্পর্ক।

রাইসু: কেইট মিলেটের বরাতে আপনি বললেন যে পরিবার, সমাজ, সংস্থা, রাষ্ট্র, সভ্যতা সবকিছুই হচ্ছে রাজনৈতিক সম্পর্ক। তার মানে ক্ষমতার ব্যাপার?

হুমায়ুন: ক্ষমতার ব্যাপার। সবকিছু ক্ষমতার ব্যাপার। ওর আরো একটি চম কার অংশ হচ্ছে ওর সাহিত্যতত্ত্ব। সেটাও এই লৈঙ্গিক-রাজনীতির মানদণ্ডে বিচার করা হয়েছে। কেইট মিলেটের সাহিত্য মূল্যায়নও আমার খুব

পছন্দ। এই জন্য যে, কেইট মিলেট কোনো গ্রন্থাকারকে ঈশ্বর বা প্রভু বলে মনে করেন না। যেমন আমাদের প্রথাগত সাহিত্য সমালোচনায় লেখক হচ্ছেন প্রভু। তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। তিনি যা বলেছেন আমাদের কাজ হচ্ছে সেটারই নানা ভাষ্য তৈরি করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন — এখানকার সমালোচকের কাজ হচ্ছে ঐ কবিতার নানারকম চম কার-চম কার ভাষ্য উপস্থিত করা। এবং দরকার হলে রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো কিছু প্রমাণ করা। কিন্তু কেইট মিলেট লেখকদের সঙ্গে বারবার প্রশ্নে এসেছেন। যে, আপনি যে কথা বলছেন এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। আপনার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। এটা শুধু মনে হওয়ার ব্যাপার না। যুক্তির সাহায্যে, সামাজিক-রাজনীতিক উদাহরণের সাহায্যে তিনি এগুলো বারবার — মানে কেইট মিলেটের রচনায় তো ডি এইচ লরেন্স এবং আরো তিনজনকে — নরম্যান মিলার এবং জঁ জেনে এঁদেরেকে — একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। এদের সে মহিমা আর নেই।

রাইসু: তাহলে ওরা কী করবে এখন স্যার?

হুমায়ুন: ওদের মহিমা, সত্যি, যেমন ডি এইচ লরেন্সের যে মহিমা ছিলো, *লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার* একবার নিষিদ্ধ হয়েছে, নিষিদ্ধ হওয়ার ২০ ব সর পরে এটি এত শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে এবং মনে করা হয়েছে যে ডি এইচ লরেন্স হচ্ছে লিঙ্গ-ঈশ্বর। বা বলা যায়, লিঙ্গ বললেও বোধহয় স্পষ্ট হয়; কেইট মিলেট তো বলেছে, সে একটি শিশ্নতান্ত্রিক সভ্যতাই স্থাপন করতে চেয়েছে। এবং শিশ্ন-ঈশ্বর। এবং এটাকে তিনি খানখান করে দিয়েছেন। এখন কিন্তু আর ডি এইচ লরেন্সকে অত মহিমামণ্ডিত, অতটা ঐশ্বরিক বলে মনে করা হয় না।

রাইসু: জঁ জেনের কেন বিরুদ্ধে তিনি?

হুমায়ুন: নারীদের তো সে একেবারে ভোগ্যবস্তুরূপে গণ্য করেছে।

রাইসু: তাহলে মানুষের ভোগ্যবস্তুগুলি কী হবে স্যার?

হুমায়ুন: মানুষের ভোগ্যবস্তু তো সারা সৌরজগতেই ছড়িয়ে আছে। পুরুষের ভোগ্যবস্তু নয়, মানুষের কিন্তু। এখন যেমন পুরুষ ভোগ করে। কেন, নারী ভোগ করতে পারবে না কেন? কিন্তু নারীকে দেখা যাচ্ছে সে ভোগ করছে না। তাকে উপভোগ করা হচ্ছে। এই ব্যাপারটাই বদলে দেয়া।

রাজু: আপনি বললেন যে সেক্সের সময় পুরুষের যে আধিপত্যটা প্রকাশ পাচ্ছে এটা তো স্যার প্রাকৃতিকভাবে সে এরকম একটি কাঠামো পেয়ে গেছে, এই কাঠামোর কারণেই তাকে এভাবে যেতে হবে। এর মধ্যে পলিটিক্সটা আপনি কীভাবে ঢোকাবেন?

হুমায়ুন: প্রাকৃতিকভাবে যে পেয়ে গেছে বললে, এই প্রাকৃতিকতার যুক্তিটাই এরা গ্রহণ করে না। কোনো কিছুই প্রাকৃতিক নয়। এগুলো হচ্ছে আমাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক শিক্ষার ফল। যেমন ধরো, তুমি যদি বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়ো, দেখবে, নূহের প্লাবনের একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিলো যে, ওই সময়ের লোকগুলো এত খারাপ হয়েছিলো যে তারা বিপরীত বিহার করতো; বিপরীত বিহার অত্যন্ত খারাপ। পরে ঈশ্বরকে অত বড়ো একটি প্লাবন দিয়ে এই পাপ ধুয়ে ফেলতে হয়েছে। তুমি যেটা বলছো এটা কিন্তু আধিপত্যের ব্যাপার। এটা হয়তো সুবিধাজনক। এই পজিশনকে বলা হয় ভিনাস অবজার্ভার।

রাজু: বা মিশনারী পজিশন স্যার।

হুমায়ুন: এটা তো খুব বিশ্বজনীন আসন। সুবিধাজনক, এটা সুবিধাজনক। বলা যাক, একই সঙ্গে সুবিধাজনক এবং প্রভুত্বের সিম্বলও বটে। তো বিপরীত বিহারের কথা প্রাচীন কামশাস্ত্রে রয়েছে। ভারতচন্দ্রের একমাত্র কাজ ছিলো

ঐগুলো বা সায়ন থেকে নিয়ে বিদ্যা এবং সুন্দরের ওপর প্রয়োগ করা। এর মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নেই। ফলে বাংলা সাহিত্যের কবি — সেই প্রাচীন সাহিত্য থেকে আজ পর্যন্ত বলা যাক — সবাই পুংগর্বী লেখক, পুংগর্বী কবি। কারণ তারা এটা ধরেই নিয়েছিলেন যে পুরুষই প্রভু, পুরুষই ঈশ্বর। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন পুংগর্বী লেখক। আমি তো একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি যে রবীন্দ্রনাথে নারীকে নিজের অধীনে রাখার ব্যাপারটি কত প্রবল। যেমন, *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে দেখা যাবে তিনি দেখাচ্ছেন যে, যে-নারী সতী, অর্থা স্বামীর চিতায় নিজেকে দগ্ধ করে — যদিও এই সময় দগ্ধ করা সম্ভব হচ্ছেলো না, কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে — সেই সতী। যে-নারী এটা করে না সে সতী নয়। বা ধরা যাক যে-নারী ঘরের বাইরে যায় — ঘরে এবং বাইরে, পুরুষের স্থান হচ্ছে বাইরে, নারীর স্থান হচ্ছে ঘরে। আর যেই নারী ঘর অতিক্রম করে বাইরে যাবে তখন তা তার জন্য বিপর্যয়কর হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যে কোনো মৌলিকত্ব নেই। তিনি এই চিন্তা পেয়েছেন উনিশ শতকের ভিক্টোরীয় কয়েকজন লেখক থেকে। এমনকি ফরাসি জা জ্যাক রুশো থেকে শুরু করে ভিক্টোরীয় লেখকদের — যেমন টেনিসন এবং আরো অনেকের, যেটা আমার বইয়ের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে — থেকে তিনি এই তত্ত্ব পেয়েছেন। ঐ ভিক্টোরীয় সেপারেট স্পেয়ার — এটি হচ্ছে পৃথক মিলের একটি তত্ত্ব। অর্থা ঘর এবং বাইরে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* বলে একটি কাব্যনাট্য রয়েছে। যেটির শেষদিকের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিকে অনেকদিন থেকেই নারীরা নারীমুক্তির শ্লোগান বলে মনে করছে। যে, আমি নারী, সামান্য রমণী — দেবী করে মাথায় রাখবে সেটি হবে না। আবার পায়ে রাখবে, তা হবে না। যদি সঙ্গে রাখো...ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা দীর্ঘকাল ধরে নারীদের একটা মূলমন্ত্রই বলা যাক, বলে গণ্য করা হয়েছে। আমি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি যে এটি কত অসাড়! এজন্য যে, এই যে চিত্রাঙ্গদা, যে রাজকন্যা হয়ে রাজপুত্রের ভূমিকা পালন করছিলো। যে রাজা হতো, সে শুধুমাত্র অর্জুনের প্রেমে প'ড়ে সমস্ত ভবিষ্য কে নষ্ট করে দিয়েছে। তারপর সে বলছে, তুমি যদি আমাকে তোমার সঙ্গে রাখো, তুমি যদি তোমার চিন্তার অংশ দাও, তাহলে আমি ধন্য হই। নিজে চিন্তা করবে না, নিজে কাজে এগিয়ে যাবে না। অনেকটা এরকম হবে, স্বামী যদি বিজ্ঞানী হয়, তাহলে সে হয়তো তার টেস্টটিউব এগিয়ে দেবে, স্বামী যদি ডাক্তার হয় সে হয়তো নার্স হবে, স্বামী যদি ঔপন্যাসিক হয়, সে হয়তো পাণ্ডুলিপির কপিয়িস্ট হবে। এ-রকমই একটি অবস্থা!

এই যে চিত্রাঙ্গদা...সে বলছে, তুমি যদি আমাকে তোমার সঙ্গে রাখো, তুমি যদি তোমার চিন্তার অংশ দাও, তাহলে আমি ধন্য হই।...স্বামী যদি বিজ্ঞানী হয়, তাহলে সে হয়তো তার টেস্টটিউব এগিয়ে দেবে, স্বামী যদি ডাক্তার হয় সে হয়তো নার্স হবে, স্বামী যদি ঔপন্যাসিক হয়, সে হয়তো পাণ্ডুলিপির কপিয়িস্ট হবে। এ-রকমই একটি অবস্থা!...রবীন্দ্রনাথ...যে মুক্ত হতে পারতো, তাকে সীমাবদ্ধ, বন্দি করে ফেললেন খুব মধুরভাবে।

রবীন্দ্রনাথ কী করলেন — একটি নারী, যে মুক্ত হতে পারতো, তাকে সীমাবদ্ধ, বন্দি করে ফেললেন খুব মধুরভাবে। এবং সবাই ভাবলো কী মধুর! এবং এই *চিত্রাঙ্গদা* অবশ্যই মৌলিক নয় কিন্তু। এটি টেনিসনের প্রিন্সেস কাব্যের যে আর্টিয়া, *প্রিন্সেস*-এর আর্টিয়াটি রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। যদিও আমাদের বাংলা সমালোচকেরা কখনোই এ-সংবাদ রাখে না। *প্রিন্সেস*-এ একটি নারী, রাজকন্যা — যে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলো এবং আর বিয়ে করবে না — দেখা গেলো তাকে নানা চক্রান্তের মধ্য দিয়ে ক্রমশ ক্রমশ ক্রমশ...সে ভেবেছিলো একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে...দেখা গেলো শেষে, ওটি বিশ্ববিদ্যালয় না হয়ে একটি হাসপাতালে পরিণত হলো এবং ঐ প্রিন্সেস একটি নার্সে পরিণত হলো! নারীর পক্ষে মুক্তি সম্ভব নয়। এবং রবীন্দ্রনাথ অবিকল সেই কাজ করেছেন।

রাজু: রবীন্দ্রনাথ তো দেখা যাচ্ছে খুবই নারীবাদ-বিরোধী লোক!

হুমায়ুন: এটির তো আমার বইয়ে প্রায় ৭০ পাতা ধরে আলোচনা আছে। নারীবাদ-বিরোধী বললে বেশি বলা হচ্ছে। বলছি নারী প্রথাগতভাবে যেখানে ছিলো এটাকে তিনি শ্বাশত ও প্রাকৃতিক বলে মনে করেছেন। ঈশ্বরের বিধান বলে মনে করেছেন।

রাইসু: তাহলে তো রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করতে হয়!

হুমায়ুন: না, রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ...আমি তো কোনোকিছুই নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতি না।

রাজু: আপনি যে নারীবাদের প্র্যাকটিশটা এখানে করলেন, আপনি ছাড়া কাদের কাজ আপনার কাছে পছন্দ বা অপছন্দের মনে হচ্ছে?

হুমায়ুন: এখানে দু'ধরনের কাজ হচ্ছে। একটি হচ্ছে আমি একটি বই লিখেছি। নারীর অবস্থা সম্পর্কে একটি বই। আমি তো একজন কর্মী নই। আমি আন্দোলনকারী নই। আমি কোনো সংস্থা স্থাপন করি নি। এটা হচ্ছে বই লেখা — চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। বহু সংস্থা রয়েছে আমি জানি। যে-সংস্থাগুলো নারীর বিভিন্ন রকমের কল্যাণ করতে চাচ্ছে। এনজিওর অর্থে অনেকগুলো সংস্থা চলছে। বা সরকারেরও সমর্থন পাচ্ছে। বা সামাজিক সমর্থন পাচ্ছে। ঐ সংস্থাগুলো পেশাগত। ঐগুলো ঠিক নারীবাদী সংস্থা এরকম বলা যাবে না। ওরা নারীর প্রথাগতভাবে যে মঙ্গল, সেটি চাচ্ছে। যেমন ধরো, দুয়েকটা সংস্থা, যেগুলো সরকারি, আমি ওদের নাম দিয়েছি 'স্ত্রী-বাদী'। নারীবাদী না। ওরা মনে করে যে স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, স্ত্রীকে পীড়ন করবে না। বেশ শাড়ি গয়না কিনে দেবে। আরেকটা বিয়ে করবে না। করলেও তালাক দেবে না। স্ত্রী যাতে সংসারে একটু ভালো থাকে সেই ব্যবস্থা করা। কিন্তু স্ত্রী যে একজন মুক্ত মানুষ হবে, নিজে উপার্জন করবে, স্বাধীন হবে এবং স্বামীর উপর নির্ভরশীল হবে না এই কথা কিন্তু তাদের নয়। এগুলো হচ্ছে প্রথাগত সংস্থা। যেমন *নারী* বইটি যখন প্রথম বেরিয়েছিলো নোরাড-এর একজন উচ্চপদস্থ মহিলা আমাকে ফোন করেন। নোরাড নরওয়েজীয় একটি সংস্থা, যারা এই দেশে বিপুল পরিমাণ টাকা — কয়েকশো কোটি টাকা — সম্ভবত দিয়েছে এই বিভিন্ন এনজিওকে। এবং নারীগবেষণা ক্ষেত্রেও বোধহয় তারা এ-পর্যন্ত আমি জানি না ঠিক কত — অন্তত ৫০ কোটি বা তারও বেশি টাকা — ব্যয় করেছে। তো আমাকে ফোন করে বললেন যে, আমরা তো নারীর অবস্থা সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ গবেষণা করাচ্ছি। এই বই যে আছে তা তো আমরা জানি না। ও বলছে যে, আমি অবাক হলাম আপনি এই ভাবে একটি বই লিখলেন আমরা জানিও না। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তো আমরা আপনাকে একটা বড় রকমের ফান্ডের ব্যবস্থা করতে পারতাম।

আমি তো ঐ প্রথাগত এনজিও গবেষক নই। আমি একটি মৌলিক বই লিখেছি। বই লেখাটাই আমার কাজ। চিন্তাকে জাগিয়ে দেয়া আমার কাজ। আমি তো টাকা-পয়সার কথা কখনো ভাবি নি। তো তিনি বললেন যে, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল না। যদিও আমরা বিভিন্ন নারী সংস্থাকে বিপুল পরিমাণ টাকা দিচ্ছি গবেষণা করার জন্য। মঙ্গল করার জন্য।

রাইসু: স্যার, আপনি তো একাই একটা নারীসংস্থা?

হুমায়ুন: না, আমি নিজেকে সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বলে মনে করি না। এগুলো অত্যন্ত বাজে ব্যাপার। সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ঐগুলো দুর্গ।

রাইসু: আপনি নিজে একটা প্রতিষ্ঠানে আছেন স্যার? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটিতে?

হুমায়ুন: আমি জীবিকার জন্য একজন কর্মী।

রাইসু: স্বেচ্ছায় না স্যার? মানে অন্য জীবিকা থাকলে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন না?

হুমায়ুন: এখন যে অবস্থা, লিখেই যদি আমার জীবিকা নির্বাহ হতো তাহলে আমি আসলে চাকরি করতাম না।

রাইসু: কোনটা ভালো লাগে আপনার কাছে — নোরাড-এর টাকা নেয়া, না বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকাটা?

হুমায়ুন: বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা এই ভাবে নিচ্ছি বলা যায়: আমি এখানে কাজ করি বেতন পাই। নোরাড-এর টাকাটা নেয়া আমার কাছে মনে হতো যে নিতান্ত টাকাটা আমি মেরে দিলাম।

রাইসু: বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা মনে হয় না? যদিও বেতন কম দেয় আপনাদের?

হুমায়ুন: আমি তো বাংলাদেশী সরকারী কর্মকর্তাদের যে সর্বোচ্চ বেতন সেটাই পাই। কয়েক বছর ধরে আমি সর্বোচ্চ বেতনভুক্ত কর্ম —

রাইসু: কর্ম চারী?

হুমায়ুন: কর্ম কর্তা কিংবা চারী।

রাইসু: কিন্তু এই টাকাই কি যথেষ্ট আপনার জন্য?

হুমায়ুন: এই টাকা তো অত্যন্ত কম! আমার জন্যই না, সবার জন্যই অত্যন্ত কম!

রাইসু: তার মানে আমরা সবাই কম পাচ্ছি টাকা, প্রয়োজনের তুলনায়?

হুমায়ুন: সেটা তো আমি ৫ বছর আগেই প্রবন্ধ লিখেছিলাম। যে, ৫০,০০০ টাকা বেতন চাই।

রাইসু: তারপর কী বললো দেনেওয়ালারা?

হুমায়ুন: না, এতে তো দেনেওয়ালা বলে কিছু নেই। এটা তো আমার প্রবন্ধ। আমি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলাম যে, আমরা যে-কাজ করি বা করা উচি তার জন্য আমরা অন্তত ৫০,০০০ টাকা বেতন প্রাপ্য। আর অন্যদেরও সেই হাড়ে বেতন বাড়ানো — এই জন্য যে, বাঙালী সারা মাস কাজ করে ৫ দিনের বেতন পায়। ৫ দিনের বেতন পায় বলে সে সারা মাস কাজ করে না। তো, আমরা যে ঘরে-ঘরে গিয়ে দেখি কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ কাজ করছে না তার কারণ হচ্ছে যে বেতনটা হলো ৫ দিনের। এই ৫ দিনে যদি সে ধারাবাহিক কাজ করে ফেলতো তাহলে তো কাজ শেষ হয়ে যেতো!

রাজু: কিন্তু স্যার আরেকটা জিনিস তো করে ওরা, সেটা হলো ঐ ৫ দিনের বেতন পেলেও ওরা তো আবার ২/৩ মাসের বেতন নিয়ে নেয়!

হুমায়ুন: মুশকিল। আর অন্য একটি ব্যাপার, যেহেতু একটি দরিদ্র সমাজ, তারপরে সরকার এই বেতনের ব্যাপারটা সম্পর্কে অত্যন্ত কৃপণ — অত্যন্ত কৃপণ বলাই ভালো। সেই জন্যে যার যেইখানে টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করার সুযোগ রয়েছে তারা সেটাতে শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করছে। এখানে, যেমন মিটার রিডার, সে হয়তো এক মাসে তার ২ বছরের বেতন আয় করছে। এখানে উচ্চকর্মকর্তা, আমদানি রফতানি, কাস্টমস — যে কোনো পেশার কর্মকর্তা — তারা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করছে। সেটি অবৈধভাবে, কিন্তু বৈধভাবে এখানে কেউ নিজের জীবন ঠিকমতো চালানো যায় এমন বেতন পাচ্ছে না। যেমন ধরা যাক যে-কোনো সচিবের কথা — সচিব আর আমার বেতন সমান। কিন্তু সচিবের জীবন এবং আমার জীবনের মধ্যে আর্থিক পার্থক্য বিশাল।

রাজু: আপনার জীবন তো অনেক মহ জীবন। সচিবের কি ঐভাবে মহ ?

হুমায়ুন: আহা, মহ জীবন তো...আমি তো মহত্ত্ব-মজিবর। কিন্তু আর্থিক অবস্থা আলোচনা হচ্ছে। এখানে আলোচনা হচ্ছে আর্থিক অবস্থা।

রাজু: তবে কি অর্থ ছাড়া মহত্ত্ব হয় না?

হুমায়ুন: মহত্ত্বের কথা বললে তো সচিবের কথা আসেই না!

রাইসু: সচিবকে কিছু একটা দেবেন না স্যার? মহত্ত্ব যদি না দেন তাহলে তো অর্থ দিতে হয়?

হুমায়ুন: সেটা অবশ্য বলবো। যেমন আমি মাঝে-মাঝেই বলি, যে, ওর অনেক কিছু পাওয়া উচিত। নইলে ও বাঁচবে কী করে?

রাজু: এই অনেক কিছু কী কী?

হুমায়ুন: আচ্ছা ধরো নিম্নমানের কবি, তার ১৫টি পুরস্কার পাওয়া উচিত। কবিতা কিছুই হয় নি; কাজেই ওকে তো পুরষ্কার দিতে হবে। মনে করা যাক, একটি সচিব। ও তো নেই। ও তো নেই-ই। এই জন্য ওর গুলশানে একটি, বনানীতে একটি, বারিধারায় একটি বাড়ি থাকা উচিত।

রাইসু: ‘নেই’ মানে স্যার?

হুমায়ুন: ‘ও নেই’ মানে তার চাকরি চলে গেলেই সে আর কেউ নয়। এবং মৃত্যুর পর তো আর কেউ-ই নয়। যদিও কবরে সে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখে যে, ‘প্রাক্তন সচিব’। কাজেই আমি মনে করি, ক্ষুদ্র মানুষ যারা তাদের অনেক কিছু পাওয়া উচিত। আমার ব্যক্তিগত চম কার অনুভূতি হয়। যেমন আমার, আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে যারা ছাত্র হিসেবে খুব সাধারণ ছিলেন। তাদের যখন দেখি কোটি টাকা হয়েছে, আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করি। আনন্দ বোধ করি, যে, আমার একটি বন্ধু, যে ছাত্র হিসেবে সাধারণ ছিলো, তার কোটি টাকা হয়েছে। এটা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক ব্যাপার। আমি মনে করি আমি চাইলে এর চেয়ে বেশি করতে পারতাম। টাকার ব্যাপারে। আমার সাধারণ বন্ধুদের প্রচুর অর্থ — আমি এটা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করি।

রাইসু: স্যার আপনি যে নিজেকে মহ বললেন — এটা কীসের প্রেক্ষিতে বললেন?

হুমায়ুন: আমি নিজেকে মহ বলি নি।

রাজু: মহত্ত্ব-মজিবর বলেছেন স্যার।

হুমায়ুন: সেটি হচ্ছে তুমি সচিবের প্রসঙ্গে যেহেতু মহত্ত্ব নিয়ে এসেছো কাজেই –

রাইসু: তাহলে আপনি মহ না?

হুমায়ুন: সেগুলো পরে স্থির করা হবে।

রাইসু: একজন শিক্ষক যদি ছাত্র পড়ায় তার মাধ্যমে সে কোনো মহ কাজ করে কিনা?

হুমায়ুন: ছাত্র পড়ানো, আচ্ছা বলা যাক, বিভিন্ন পেশার কথাই ধরো যে, একজন লোক জুতো সেলাই করে। ওটি তার পেশা, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি। একজন লোক ছাত্র পড়ায়, এটা তার জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি। এখন জুতো সেলাই করাটা মহ কাজ নয়, জ্ঞান দান করাটা মহ কাজ — এটা আমাদের সমাজ মনে করে থাকে। যেগুলোকে আমরা মূল্যবোধ বলে থাকি। যে এই কাজটি উচ্চমানের। যেমন ধরা যাক একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে আমি অনেক বেশি শ্রদ্ধা করি একজন মন্ত্রী থেকে। কেননা আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি। মন্ত্রীত্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি না।

রাইসু: কেন স্যার, মন্ত্রীরা তো অনেক বড় বড় কাজ করেন?

হুমায়ুন: মন্ত্রীরা কোনো বড় কাজই করে না, ওগুলো কিছুই না। আমার তো প্রবচন একটা ছিলো এরকম যে: “বাসায় একটি মাস্তান থাকা খুবই প্রয়োজন। তাহলে পরিবারের পিতা রাস্তায় গেলে বেশি করে সালাম পায়, পরিবারের কন্যাটিকে রাস্তার মাস্তানরা বেশি জ্বালাতন করে না, এবং বাসায় একটি মন্ত্রী থাকার সম্ভাবনা থাকে।”

রাইসু: আপনার কোন ফ্যাকাল্টির কারণে প্রবচনগুলি তৈরি হলো স্যার। মানে কোন কাজগুলি করতে না পারার কারণে আপনার প্রবচন?

হুমায়ুন: না পারার জন্য তো এগুলো হয় না। বরং পারার জন্যই এটি হয়েছে। প্রবচনের ব্যাপারটি হচ্ছে, কোনো একটি সত্যকে বা উপলব্ধিকে খুব সংহত, তীক্ষ্ণ বাক্যবিন্যাসের সাহায্যে প্রকাশ করা। যেটি বাংলা ভাষায় সাধারণত হয়। ফরাসী ভাষায় এটি হয়েছে। ফরাসীরাই সবচেয়ে বেশি সচেতনভাবে প্রবচন লিখেছে।

রাইসু: রুশফুকো?

হুমায়ুন: হ্যাঁ, রুশফুকো। এবং আরো অনেকেই লিখেছেন। রুশফুকোরটা বিখ্যাত। আর ইংরেজি ভাষায় সচেতনভাবে হয় নি। তবে পৃথিবীর সমস্ত ভাষায়ই কমবেশি প্রবচন রয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের বেশকিছু উক্তিকে আমি প্রবচন বলে মনে করি। যেমন ধরা যাক ভারতচন্দ্র রায়ের “নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়”। নগরে যদি আগুন লাগে তাহলে দেবালয়ও রক্ষা পায় না। ওটিও ধ্বংস হয়। এরকম তার কিছু স্মরণীয় উক্তি রয়েছে। আমি প্রবচন লিখলাম অনেকটা মজা করার জন্য। আমার কতগুলো সত্য উপলব্ধি যেগুলো নিয়ে আমি দীর্ঘ রচনা কখনোই লিখতে যাবো না সেগুলোকে সংহতভাবে প্রকাশ করার জন্য। প্রবচনের আরেকটি সুবিধা হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ক উপলব্ধি খুব সংহতভাবে প্রকাশ করা যায়। সেখানে সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি সবকিছু নিয়ে খুব সংহত ও তীক্ষ্ণভাবে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করা যায়।

রাইসু: আমাদের লেখকসমাজ নিয়ে কোনো প্রশ্ন কি জিগ্যেশ করতে পারি?

হুমায়ুন: এখন সাম্প্রতিক ব্যাপারেই সবচেয়ে ভালো হবে।

রাইসু: আমাদের রাজনীতি নিয়ে বলেন তাহলে।

হুমায়ুন: আমাদের এখনকার রাজনৈতিক টানা-হ্যাচরা। এই যে নির্বাচন সামনে। এই যে সংসদ থেকে বেরিয়ে গেলো। একদল বলছে এটা বৈধ না। আরেকদল বলছে বৈধ।

রাইসু: বা, এরশাদের যে জণ্ডিস হয়ে গেলো! পাঁচ বছর জেলে থাকতে থাকতে। নয় বছর শাসন, পাঁচ বছর জেল। এই চৌদ্দ বছরের যে এরশাদীয় কর্মকাণ্ড। আপনার কি জানা আছে স্যার?

হুমায়ুন: এরশাদ সম্পর্কে ভাবলে আমার বেশ কৌতুক লাগে। তাকে আমার এখন মনে হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে নির্বোধ একনায়ক। পৃথিবীতে যুগে যুগে কত বড়, ছোট, পাতি একনায়ক এসেছে। কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কেউ বেশ ভালোই থেকেছে। এরশাদ ইচ্ছে করলে বিদেশে চলে যেতে পারতো, ভালো থাকতে পারতো। আমার মজা লাগে যে, এই লোকটি শেষ মুহূর্তে গণতন্ত্রের নামে নিজেকে সমর্পণ করে খুব ঝামেলায় পড়ে গেছে। সে বিদেশে গিয়ে মেরী বা নতুন কোনো মেরীকে নিয়ে ভালোই থাকতে পারতো।

রাইসু: ভদ্রতা করতে গিয়ে গণ্ডগোল করে ফেললেন?

হুমায়ুন: ভদ্রতা না, এ মুহূর্তে বলা যাক, গণতন্ত্রের দীক্ষা নিয়েই গোলমালে পড়ে গেলো। এবং মজা হচ্ছে এই যে, এরশাদের সঙ্গীরা এখন গণতন্ত্রের মিছিলকারী। তার কাছে যারা জুতোর মতো ছিলো সেই জুতোর মতো লোকেরা সংসদে রয়েছে, মিছিল করছে, পত্রিকায় ছবি ছাপা হচ্ছে। আর এ-মুহূর্তে সে জেলখানায় পঁচছে, জণ্ডিসে নষ্ট হচ্ছে, সম্ভবত বেশিদিন টিকবে না।

রাইসু: এটা বললেন স্যার?

হুমায়ুন: হ্যাঁ, আমি যে-জণ্ডিসের কথা শুনলাম সেটা খুব মারাত্মক জণ্ডিস নাকি।

রাজু: আপনি কি এরশাদের সময় খুব খারাপ অবস্থায় ছিলেন?

হুমায়ুন: আমি তো এরশাদের বিরুদ্ধে প্রচুর লিখেছি। আমার ৫টি বই রয়েছে এরশাদের কালের বাংলাদেশ সম্পর্কে।

রাইসু: তাহলে তো আপনাকে ক্রিয়েটিভ বানিয়ে ফেলেছেন এরশাদ!

হুমায়ুন: না, বলা যাক, আমার সৃষ্টিশীলতা অনেকটা দমিয়ে দিয়েছিলো। কারণ আমাকে তীক্ষ্ণ রাজনীতিক-সামাজিক প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। এবং আমি নানা সময়ে নানাভাবে হুমকির সম্মুখীন হয়েছি। তবে পরিস্থিতি যে এখনকার থেকে খারাপ ছিলো এমন নয়।

রাইসু: একইরকম?

হুমায়ুন: একইরকম। পরিস্থিতি তো আমার কাছে একইরকম মনে হয়।

রাইসু: কেন স্যার! এখন তো আমরা একটা 'গণতান্ত্রিক' যুগে বাস করছি?

রাজু: নাকি স্যার গণতান্ত্রিক হুযুগে? কোনটা?

হুমায়ুন: আমরা এখন গণতান্ত্রিক হুযুগের যুগে বাস করছি। এরশাদের পর্বের পর এই পর্বে একটি নির্বাচন হয়েছে। এবং নির্বাচিত একটি সরকার এসেছে। সংসদে এই সরকারি দল, বিরোধী দল গেছে। কিন্তু তারা দুই দল মিলে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। কোনোরকম গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরি হয় নি। গণতন্ত্রের জন্য যেসব শুভ কাজগুলি করা উচি ছিলো কোনো কিছুই করা হয়নি, সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পাই, এরশাদের যে 'জাতীয় পার্টি' স্বৈরাচারী দল বলে গণ্য হতো তারা এখন গণতন্ত্রের প্রহরী হয়ে উঠেছে। জামাত, যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, যে স্বাধীনতার বিপক্ষে কাজ করেছে ঐ রাজাকাররা এখন গণতন্ত্রের প্রহরী হয়ে উঠেছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত সংকটজনক। আমরা যে এখন একটি, বলা যাক,

রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে আছি সেটি হচ্ছে ক্ষমতার সংকট। কিন্তু তার চেয়ে গভীর সংকট হচ্ছে আমরা আমাদের সমাজ এবং রাজনীতিকে নষ্ট করে ফেলছি। গণতন্ত্রের নামে। গণতন্ত্রের নামে আমরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফেলছি। রাজনীতিকরা, বলা ভালো, কেউই ঠিক গণতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন নন।

রাজু: তাহলে এরা কী ধরনের লোক? কী হিসেবে চিহ্নিত করবেন?

হুমায়ুন: এরা সবই হচ্ছে সামন্ত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ। তারা প্রভু হতে চায়, প্রভু হয়ে অসীম শক্তি ভোগ করতে চায়। এবং শক্তির সঙ্গে প্রচুর টাকার দরকার। এবং তারা রোজগার করে ফেলেছে। এখন যারা বিরোধী দলে রয়েছে, তারা ৫ বছর ধরে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে নি। তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করা দরকার। তাদেরও প্রচুর টাকা-পয়সা দরকার।

রাইসু: আপনার *নারী* নিষিদ্ধ হওয়ার পর *ইত্তেফাক*-এ আল মাহমুদ বললেন যে, আপনার লেখার বক্তব্য ও মনোভাব নাকি কু সিত। এবং আপনার বইয়ের মাধ্যমে ক্ষতি যা করার তা নাকি করা হয়েছে। এখন আড়াই বছর পরে এই বই বাজেয়াপ্ত করা অর্থহীন। আপনার সতীর্থ আল মাহমুদ, তিনি এ-রকম বললেন!

হুমায়ুন: আল মাহমুদ, একটি অমার্জিত রুচিসম্পন্ন, অস , কপট মানুষ। এই আল মাহমুদ অনেক আগে পাড়ার মসজিদ ভেঙে পড়ার শব্দ শুনে আনন্দিত হয়ে কবিতা লিখেছে। যে, ‘হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে পাড়ার মসজিদ’। সে জায়নামাজে বসে পরস্ত্রী সঙ্গমের স্বপ্ন দেখে। তার কবিতার মধ্যে রয়েছে। যে একসময় কৃষকেরা এসে সচিবালয় দখল করে ফেলবে এবং দেশে কৃষকের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এই স্বপ্ন দেখেছে। এখন সে একটি রুচিহীন, অস , কপট, জামাতী মৌলবাদী। এবং তার মধ্যে একটি মজার কপটতা হচ্ছে সে যখন বাংলাদেশের পত্রিকায় কবিতা লেখে তখন সে ইসলামের কবিতা লেখে। আর যখন ভারতীয় পত্রিকায় কবিতা লেখে তখন হিন্দু আর বৌদ্ধের কবিতা লেখে। আমি কয়েকদিন আগে তার একটি কবিতা দেখেছি যেখানে সে নিজেকে গৌতম বুদ্ধ হিসেবে দেখেছে। যে, সে যেন পূর্বজন্মে গৌতম বুদ্ধ ছিলো। এইটি একটি অত্যন্ত কপট লোক, এবং সুবিধাবাদী। সে জামাতের অর্থেই এখন পালিত বলে আমি শুনেছি। তার কথায় কিছু আসে যায় না। তার কবিতা সেই ষাটের দশকেই শেষ হয়ে গেছে।

রাজু: তিনি কবে থেকে শুরু করেছেন?

হুমায়ুন: পঞ্চাশের দশকে শুরু করেছিলো, ষাটের দশকে কয়েকটি বই বেরিয়েছিলো। সত্তর আশি এরপর যে সমস্ত কবিতা লিখেছে এগুলো কিছু না।

রাইসু: এগুলো তার ঐ মন্তব্যের কারণে বলছেন স্যার?

হুমায়ুন: তার সম্পর্কে যে দু’চারটি মন্তব্য আমার কয়েকটি প্রবন্ধে করেছি তা-ও একই। ও, আরও একটি কারণ হতে পারে। সে আমার ওপর ক্ষিপ্ত নানা কারণে। একটি কারণ সম্ভবত, ওর একটি খুবই আত্মগর্বী কবিতা ছিলো যে, ‘আমার মাকে যেন কেউ গোলামের গর্ভধারিণী বলতে না পারে’। ঐ কবিতাটিকে আমি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে একটি কবিতা লিখেছিলাম। নাম ‘গোলামের গর্ভধারিণী’। আমি দেখিয়েছিলাম যে, আপনার এই পুত্রটি যদি, হে জননী, এই তিতাসের পাড় ছেড়ে ঢাকায় না আসতো তা হলেই ভালো হতো। আপনার ছেলেটি হয়তো মাছ ধরতো তিতাসে। বা রাখালের কাজ করতো। ভালো থাকতো। এই ঢাকায় মোগলদের শহরে এসে সে যে নষ্ট হয়ে গেছে। সব প্রভুকে সেজদা করতে করতে এখন তার পিঠে একটি বড় রকমের কুজ্ দেখা দিয়েছে। এখন তার দিকে তাকালে একটি কুজ্ই চোখে পড়ে। আর কিছু চোখে পড়ে না। এখন আপনার যখন মৃত্যু হবে তখন হয়তো দেখবেন যে আপনার কবরের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে এবং শব্দ হচ্ছে যে এখানে একজন গোলামের গর্ভধারিণী ঘুমিয়ে আছে। এবং আল মাহমুদ এখন গোলাম আল মাহমুদের মতো আচরণ করছে।

রাজু: তো এটা স্যার ব্যক্তিমানুষকে আক্রমণ করা হয়ে গেলো না?

হুমায়ুন: আচ্ছা, ব্যক্তি এবং কবিকে আমরা কীভাবে পৃথক করবো? এটা পারি না। এখন বলবো, তিনি কবি হিসেবে এই, আর ব্যক্তি হিসেবে এই — এটা এই সময়ে করা যাবে না। আমরা অবশ্যই দেখবো যে, এই কবিটি ব্যক্তি হিসেবে কেমন ছিলো — স ছিলো না অস ছিলো। এটা আমাদের দেখতে হবে। এর রুচি কেমন ছিলো। আরো বলা ভালো যে, এই আল মাহমুদ এরশাদের সময় এরশাদীয় দলে ছিলো, আবার এখন বোধহয় জামাত এবং অন্যান্য শক্তিমানদের সঙ্গে রয়েছে। সুবিধাবাদী মানুষ।

রাজু: আচ্ছা এটা কি সাহিত্যকে কোনোরকম ক্ষতি করে কিনা?

হুমায়ুন: সুবিধাবাদী মানুষের সাহিত্য আসলে সাহিত্যই নয়। আল মাহমুদের যে কিছু লেখা এখন কবিতা নামে ছাপা হয় ওগুলো কবিতাই নয়। ওগুলো হচ্ছে কতগুলো বাজে কথা। ওর একটি আত্মজীবনী আমি পড়েছি। এবং পড়ে মজা পেয়েছি এই জন্য যে পাতায় পাতায় মিথ্যে কথা রয়েছে।

রাইসু: স্যার, মিথ্যে কথাই তো শিল্প, একঅর্থে?

হুমায়ুন: না, মিথ্যে কথা শিল্প নয়।

রাজু: তবে কি সত্য কথা?

হুমায়ুন: সত্য কথাও যে শিল্প হবে তাও নয়। শিল্প মিথ্যা এবং সত্যর বাইরের ব্যাপার। অন্তত এই সামাজিক সত্য এবং মিথ্যার বাইরের ব্যাপার।

রাজু: তার মানে একটি পরম সত্যের দিকে যেতে চায় সে?

হুমায়ুন: পরম সত্য কাকে বলে আমি ঠিক জানি না। আমরা —

রাইসু: অন্য দিকেই গেলে ভালো — ?

রাজু: আচ্ছা স্যার, এই সরকারের আমলে তো আপনি বোধহয় বাকস্বাধীনতার পঞ্চম শিকার।

হুমায়ুন: শিকার বলা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। কারণ আমি মনে করি না যে এই সরকার আমার বই নিষিদ্ধ করে রাখতে পারবে। আমি এই বইকে নিষিদ্ধ বলেই গণ্য করছি না। আর আমার এক বন্ধু খুব মজা করে বলেছে যে, এই সরকার চলে যাচ্ছে, সঙ্গে তোমার বইটিও নিয়ে যাচ্ছে।

রাইসু: স্যার, আপনি নাকি আঁতাত করে বইটি নিষিদ্ধ করিয়েছেন?

হুমায়ুন: তোমাদের মতো ফাজিলদের সঙ্গে কথা বলা সময়ের অপচয়।

রাইসু: তো, এই যে নিষিদ্ধ করলো, এই নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে একটা প্রবচন বলেন।

হুমায়ুন: … "প্রতিটি নিষিদ্ধ গ্রন্থ মানুষকে জানিয়ে দেয় যে বর্বররা এখনও সভ্যতাকে দখল করে আছে।"

রাজু: যে সরকার বই নিষিদ্ধ করতে পারে তাদের কাছে বাকস্বাধীনতা চাওয়ার কোনো ব্যাপারই থাকে না। সেক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানেরও স্বাধীনতা থাকার কথা না। এখন আমরা জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারি কীভাবে?

হুমায়ুন: বিষয়টি বেশ বড়। প্রথম হচ্ছে যে স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না। স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হয়। এমন নয় যে আমাকে সমস্ত স্বাধীনতা লেখায় দিয়ে দেয়া হবে। এবং আমি আনন্দের সঙ্গে লিখতে থাকবো। স্বাধীনতা প্রতিটি লেখক সৃষ্টি করে নেয় নিজের জন্য। অনেক সময় দণ্ডিত হয়, অনেক সময় দণ্ডিত হয় না। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে বাঙালি এবং বাঙালি মুসলমানের অবস্থা এবং জ্ঞানের অবস্থা এবং স্বাধীনতা। আমি মাঝে মাঝে একটু দুঃখই পাই যে এই বাঙালি মুসলমানের বিকাশ নানাভাবে প্রতিহত করা হয়। এবং সারা পৃথিবীতে মুসলমানের বিকাশকেই প্রতিহত করা হয়েছে। এই ধর্মানুভূতির নামে। বাঙালি মুসলমান এইজন্য অনেক পিছিয়ে আছে। তার জ্ঞানের জগৎ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমাদের যদি জ্ঞানচর্চার অধিকার দেয়া হতো, তাহলে আমাদের নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা আরো গভীরভাবে জ্ঞানচর্চা করতে পারতাম। মুসলমান সমাজে, সারা পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যেই কিন্তু এটা হয়েছে। যে, বড় বড় প্রতিভারা এই সমস্ত সংকটে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েই। বাঙালি মুসলমানদের ইতিহাস হচ্ছে দেখবে এই প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের তর্ক-বিতর্ক এবং দ্বন্দ্বের ইতিহাস। ফলে ঐ দ্বন্দ্ব করতে করতেই, তর্ক করতে করতেই ওদের জীবন শেষ হয়ে গেছে। একটি ভালো বইও আর লেখা যায় নি। আমরা বাঙালি না মুসলমান এই তর্ক করতে করতেই শেষ হয়ে যাচ্ছি। ফলে বাঙালি মুসলমান এখন সব বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতে পারে না। তাকে চিন্তা করার অধিকারই দেয়া হয় নি। এজন্যই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয় না। আমাদের বিদ্যালয়ে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয় না। এবং আমাদের সমাজে নতুন জ্ঞানের অভাব অত্যন্ত প্রকট। আমাদের রাষ্ট্র সাধারণত যারা চালায় তাদের জ্ঞানের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তারা ক্ষমতা দখল করে এবং ক্ষমতাকে উপভোগ করে যেতে পারলেই সুখে থাকে। জ্ঞান চুলায় যাক, তাদের কাছে জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। কিন্তু একটি জাতি যদি বিকশিত হতে চায়, তার স্বাধীনতা থাকা দরকার। সমস্ত বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। আমরা নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। আমি মুসলমানদের ক্ষেত্রেও যে জিনিসটা মাঝে-মাঝে বোধ করি, যেমন ধরো যে মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাস — মুসলমানদের প্রধান প্রধান ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা কিন্তু বলা যাক, প্রশ্ন করতে পারি না। তাদের জীবনকে, তাদের কর্মকে, তাদের সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করতে পারি না। ফলে তাদের সঙ্গে কিন্তু আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক হয় না। আমরা একটা ভীতির মধ্যে থাকি। যদি আমরা প্রধান ব্যক্তিগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করতে পারতাম, হয়তো আমরা অনেক সীমাবদ্ধতা বের করতে পারতাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের আমরা ভালোও বাসতে পারতাম। এখন তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ভালোবাসার হয়ে উঠছে না। এটা মুসলমানদের জন্য একটি ক্ষতিকর দিক। এইজন্য একদল মৌলবাদী হয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু, বলা যাক, ঐ প্রাচীন যারা আছে তাদের মেনে মেনে একেবারে... তাদের মানাই হচ্ছে মুসলমান। আরেকদল আমাদের মতো হয়ে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার ভালোবাসার কোনো অভাব নেই। কিন্তু আমি কিছুতেই বিনা প্রশ্নে তার সমস্ত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবো না।...তেমনি যদি আমাদের এ-অধিকারটুকু থাকতো যে মুসলমানদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে আমরা পুনর্মূল্যায়ন করতে পারবো তাহলে একটি সুস্থ্য চিন্তাশীল মুসলমান জাতি গঠিত হতে পারতো। এই সংকীর্ণ মুসলমানরা মুসলমানদের বড় শত্রু

যেমন, আমি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানান রকম প্রশ্ন পোষণ করে থাকি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার ভালোবাসার কোনো অভাব নেই। কিন্তু আমি কিছুতেই বিনা প্রশ্নে তার সমস্ত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবো না। তার সব কবিতাকে মহৎ কবিতা বলে গ্রহণ করতে রাজি নই। ঠিক তেমনি যদি আমাদের এ-অধিকারটুকু থাকতো যে মুসলমানদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে আমরা পুনর্মূল্যায়ন করতে পারবো তাহলে একটি সুস্থ্য চিন্তাশীল মুসলমান জাতি গঠিত হতে পারতো। এই সংকীর্ণ মুসলমানরা মুসলমানদের বড় শত্রু *ঢাকা, ২৩/১১/১৯৯৫*